# বিজন ভট্টাচার্য

গণনাট্য তখনই সম্ভব হইবে যখন গণেরা নাট্যের অনুষ্ঠান করিবে।

—বিজন ভট্টাচার্য : পাক্ষিক অভিনয় (১.৮.১৯৭২)

বিজন ভট্টাচার্য (১৯১৭-১৯৭৮) গণনাট্য আন্দোলনের পুরোধা পুরুষ যিনি বাংলায় 'প্রথম বিপ্লবী লোকায়ত নট ও নাট্যকার' (রণেশ দাশগুপ্ত) রূপে অভিহিত হয়েছেন। দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে তিনি 'একটা যুগের প্রতীক'। অভিনয় পরিচালনা ও নাটক রচনা—প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিজন ভট্টাচার্য ছিলেন অতীব দক্ষ। তাঁর নাটক দিয়েই ভারতীয় গণনাট্য সংঘের জয়যাত্রা শুরু হয়েছিল। তিনি ছিলেন প্রবলভাবেই সমাজ সচেতন—তিনি ছিলেন মাটির মানুষের নাট্যকার, বাংলার কৃষকসমাজের আবেগ আকুলতা, সমস্যা সংকট তিনি সম্যক উপলব্ধি করেছেন ও নাটকে তাকে যথাযথ রূপ দিয়েছেন। তিনি প্রগতিশীল ভাবনার শরিক ছিলেন—অন্যায় অবিচার শাসন শোষণের অবসান চেয়েছেন নিশ্চিত প্রত্যয়ে। বিজন ভট্টাচার্য বাংলা নাটকের একটা গতিপথ নির্ণয় করে দিয়েছেন : 'দেবী গর্জন' এ প্রসঙ্গে অবশ্যই উল্লেখ্য। জোতদার মহাজনের অপরিসীম লোভ ও লালসা, কৃষকদের ওপর অত্যাচার, নারী নির্যাতন, অসহায় চাষীকৃষকদের জোট বাঁধা ও মহাজনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো এবং তাদের হাতে অত্যাচারীর মৃত্যু : শ্রেণী সংগ্রামের এই আদর্শ বিজন ভট্টাচার্যই প্রথম নির্মাণ করেন এবং সেই অর্থেই প্রগতিশীল নাট্য আন্দোলনের তিনি অগ্রণী পুরুষ। বিজন ভট্টাচার্যের বিশিষ্ট নাটক হল—'আগুন' (১৯৪৩), 'জবানবন্দী' (১৯৪৩), 'নবান্ন' (১৯৪৪), 'গোত্রান্তর' (১৯৫৭), 'মরাচাঁদ' (১৯৬০), 'দেবী গর্জন' (১৯৬৬), 'গর্ভবতী জননী' (১৯৬৯), 'লাস ঘইরা যাউক' (১৯৭০), 'হাঁসখালির হাঁস' (১৯৭৭) ইত্যাদি।

ভারতীয় গণনাট্য সংঘ প্রযোজিত 'নবান্ন' আধুনিক বাংলা প্রগতিশীল নাট্য আন্দোলনের প্রথম উল্লেখ্য সৃষ্টি। বিষয়বস্তুর দিক থেকে এটি নতুন এবং মঞ্চ আঙ্গিকের দিক থেকেও এটি অভিনব। নাটকের পরিচালক ছিলেন বিজন ভট্টাচার্য ও শম্ভু মিত্র এবং গণনাট্যের শিল্পীরাই ছিলেন এর কুশীলব। বেয়াল্লিশের পটভূমিকায় নাটকটি লেখা। নাট্যকার বলেছেন—"ঘরে যেদিন অন্ন ছিলনা, নিরন্নের মুখ চেয়ে সেদিন আমি 'নবান্ন' লিখেছিলাম। নাটক আরম্ভ করেছিলাম ১৯৪২ সালের জাতীয় অভ্যুত্থান আগস্ট আন্দোলনকে স্বাগত জানিয়ে"। নাটকের প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্য যেন মাতঙ্গিণী হাজরার লড়াইয়ের অগ্নিময় রূপ; পরবর্তী দৃশ্যসমূহ প্রধান সমাদ্দারের পরিবার ও গৃহজীবনের চিত্র। ২য় ও ৩য় অঙ্ক কলকাতায় আসা গ্রামবাসী কৃষকদের শোচনীয় জীবনচিত্র। ৪র্থ অঙ্কে নবান্ন উৎসব। অবশ্য

Scanned with CamScanner

মনে হয় কাহিনীতে সংহতি সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য যেন অনুপস্থিত। 'নবান্ন'র প্রযোজনা ছিল অসাধারণ। এর বৈশিষ্ট্য ছিল নিরাভরণ সারল্য। তদানীন্তন পেশাদারী মঞ্চের আতিশয্য পরিহার করে চটের মঞ্চসজ্জায় বা কালিঝুলি মাং নাংরা ছেঁড়া জামাকাপড়পরা মানুষদের বিন্যাসে ছিল সৃষ্টির পূর্ণতা। ছিল সামান্য আলোর অসামান্য প্রয়োগ। নাটকের গান ছিল সুন্দর। শেষ দৃশ্যে একটি গান সংযোজিত হয়—জননীগো জন্মভূমি, বন্দিগো রাণী। গান দিয়ে এই শেষ দৃশ্যের বর্ণনায় শম্ভু মিত্র বলেছেন—

"এই গানের সময়ের দৃশ্য রচনাটিও বড় সুন্দর হোতো। মঞ্চের সামনের দিক দিয়ে মেয়েরা মাথায় প্রদীপ নিয়ে এই গান গাইতে গাইতে যেত। এদের ওপর কোনো আলো থাকত না। উইংসের পাশ থেকে ফ্লাড দেওয়া হতো মঞ্চের পেছনে। সিল্যুয়েটের চেহারা আসত। মাথার ওপরে কাঁপত দুর্বল আলোক শিখাগুলি। চমৎকার দেখতে লাগত। সিল্যুয়েটের ব্যবহার তখন ছিলনা।' (বহুরূপী—৩৪)

নবান্নের শিল্পীরা হয়ত তেমনভাবে পেশাদার ছিলেন না সবাই, কিন্তু তারা প্রত্যয়ী আদর্শনিষ্ঠ; এককভাবে নয়, সমবেত প্রয়াসে তাঁরা শিল্পের আশ্চর্য রূপ নির্মাণ করেছেন। মহর্ষি মনোরঞ্জন বলেছেন—

'নবান্ন পড়ে মনেই হয়না এর মঞ্চোপযোগিতা থাকতে পারে। এ নাটকের রূপ দেবার সাহস ও সফলতা গণনাট্য সঙ্ঘের পক্ষেই সম্ভব। কারণ, এমন আদর্শবাদী রূপতপস্বী সমবায় কোনও ব্যবসাদারী থিয়েটারের পক্ষে গড়ে তোলা সম্ভব নয়। ছোট বড় বহু সংখ্যক ভূমিকা সমানভাবে প্রাণ দিয়ে অভিনয় করতে পারেন তারাই, যাঁরা জানেন মাত্র, জনসেবাই এর লক্ষ্য—নিজেদের প্রতিষ্ঠা নয়' (জনযুদ্ধ, নভেম্বর দিবস বিশেষ সংখ্যা, ৮.১১.১৯৪৪)।

এক অন্ধ দোতারা বাদককে নিয়ে সংগ্রামের ছবি আঁকা হয়েছে 'মরাচাঁদ' নাটকে। পূর্ব বাংলা থেকে আসা ছিন্নমূল মানুষদের ভাগ্য বিপর্যয় ও শোচনীয় দুরবস্থার কথা বলা হয়েছে 'গোত্রান্তর' নাটকে।

নাট্যকার 'দেবী গর্জন' নাটকের ভূমিকায় জানিয়েছেন যে ঊষর লালমাটির দেশ বীরভূমের পটভূমিতে আদিবাসী ও সাঁওতাল চাষীদের কৃষক আন্দোলনের ভিত্তিতে, শত্রুকে পরাহত করে, জননীকে খুঁজে পাবার সংগ্রামী সাধনা রূপবদ্ধ হয়েছে 'দেবী গর্জন' নাটকে যে নাটকটি ভাবনায় ও আঙ্গিকে বাংলা প্রগতিশীল নাটকের একটা প্যাটার্ন তৈরি করে দিয়েছে। প্রসঙ্গত নাটকটির কাহিনী স্মরণ করা যায়। জমিদারী প্রথা বিলুপ্ত হয়েছে। প্রভঞ্জন এক মধ্যস্বত্বভোগী; সে সব জমি টুকরো টুকরো করে নিজের তহশীলভুক্ত করেছে। বিলোপ করেছে পঞ্চায়েতী ব্যবস্থা এবং সামন্ত প্রভুদের মতো চালাচ্ছে শাসন ও শোষণ যার ফলে চাষীরা সর্বস্বান্ত হচ্ছে ও প্রভঞ্জনের ধানের গোলা ভরে উঠছে। চাষীদের অন্দরমহলও প্রভঞ্জনের কামনায় বিধ্বস্ত হয়। সর্দারের পুত্রবধূ রত্না তাদের খোলান থেকে নিরুদ্দিষ্ট হয়। কিন্তু প্রভঞ্জন শেষ পর্যন্ত নিজেকে বাঁচাতে পারল না। চাষীরা জোট বাঁধে সর্দারের ছেলে মংলা ও ভুঁইচাষী সঞ্চারিয়ার নেতৃত্বে। চাষীদের আক্রমণে প্রভঞ্জনের লাঠিয়ালরা পর্যুদস্ত হল। প্রভঞ্জনের সব অন্যায় কাজের সঙ্গী ত্রিভুবন পালাল। মংলা খুঁজে পেল রত্নাকে যে প্রাণ দিয়ে নিজের মান বাঁচিয়েছে। চাষীরা বল্লম টাঙি রামদা কুঠার নিয়ে ঘিরে ফেলে প্রভঞ্জনকে—তার মাথার ওপর উদ্যত হয় ধারালো অস্ত্র, সে ভয়ে আতঙ্কে নেতিয়ে পড়ে, অসুরনিধনের বাজনা বাজে, এবার নিধন হবে অসুর। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ব্যথিত শিল্পীচিত্তের প্রকাশ ঘটেছে 'লাস ঘইরা যাউক' নাটকে। 'নীলদর্পণ' (দীনবন্ধু মিত্র) ও 'জমিদার দর্পণ' (মীর মশাররফ হোসেন)-এর সার্থক উত্তরসূরি বিজন ভট্টাচার্যর 'নবান্ন' ও 'দেবী গর্জন' : এ সিদ্ধান্ত অযথার্থ হবে না।

Scanned with CamScanner